মা সি ক
সোমবারে
স ঙ্ক ট
তৃ তী য় সং খ্যা
১ ৭ চৈ ত্র ১ ৪ ৩ ১
৩ ১ শে মা র্চ ২ ০ ২ ৫

সম্পাদকীয়

দীর্ঘ বিরতির পর আবারো ফিরছে সোমবারে সঙ্কট। দ্বিতীয় সংখ্যার ধারাবাহিকতায় তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশ করাটা আসলেই অনেক আনন্দের। বিরতিটা ছিল যেহেতু দীর্ঘ সেজন্য এবারের সংখ্যায় থাকছে অনেক আয়োজন। প্রথমেই তৃতীয় পর্বের মাধ্যমে শেষ হচ্ছে তিন পর্বের মিনি থ্রিলার সিরিজ 'ফটোগ্রাফার'। প্রচ্ছদ রচনা, গা ছমছম করা একটি ভৌতিক গল্প, একটি ছোট গল্প, "অন্য আমি" সিরিজের ৩য় পর্ব সব থাকছে এ সংখ্যায়। নিয়মিত বিভাগগুলোও থাকছে বরাবরের মতোই।

আশা করি সবার ভালো লাগবে এ সংখ্যা। সোমবারে সঙ্কটের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা।

Ali Raihan Sapno

সোমবারে সঙ্কট

মার্চ সংখ্যা

৩১ শে মার্চ, ২০২৫

১৭ চৈত্র, ১৪৩১

বর্ষ ১ সংখ্যা ৩

সম্পাদক

আলী রাইহান স্বপ্ন

সহ সম্পাদক

মৃন্ময় দাস

শিল্প নির্দেশনা

জেরিন রিশামণি জিম

মিডিয়া টেক টিম

অসীম রায়

কানিজ সুমাইতা প্রথা

সূচিপত্র

ব র্ণ চো রা

মৃন্ময় দাস

রাতে বৃষ্টি হয়েছে। তাই ভোরে হালকা ঠাণ্ডা মতো পড়ায় চাদর মুড়িয়ে বেলা পর্যন্ত ঘুমানোর জন্য পাশ ফিরেছি কি তখনই ফোনটা বেজে উঠলো। ওপাশ থেকে সুধিরের গলা, স্যার, বক্সী বাজারের ডা. দত্ত খুন হয়েছেন। দ্রুত আসুন। উনি আসছেন।

আর কি শুয়ে থাকা যায়। চোখে মুখে জলের ঝাপটা মেরে শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে পড়লাম।

হাজী লেন থেকে বক্সী বাজার যেতে এক ঘন্টা লেগে গেলো। সকাল বেলা বাইকে হলেও গলি রাস্তায় জল জমে অবস্থা খারাপ আর পার্ক লেনের শেষ মাথায় ডা. দত্তের পুরোনো বাড়ি, আনন্দ মহল। একাই থাকতেন। শুধু দেখা শোনা করার জন্য এক পুরোনো চাকর আর রান্নার জন্য বামুন ঠাকুর বাসাতেই থাকে। আর ঘরকন্নার কাজের জন্য এক মাসি আছে প্রতিদিন দুপুরে একবার করে আসে।

বাড়ির চৌকাঠে পা রাখতেই দেখি উনি দাঁড়িয়ে আছেন। উনি মানে গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর এবং আমার বস তাসফিন সিকদার। সোজা হয়ে সম্মান জানিয়েই ভিতরে চলে গেলাম কথা বলতে বলতে।

একে হাই প্রোফাইল কেস তার উপর কথা বলে বুঝলাম বছরের শুরুতে যে দুটো খুন হয়েছিল জানুয়ারি আর মার্চ মাসে, সেই প্যাটার্নেই এই খুন। তাই এবার আগেই সিকদার স্যারের কাছে ফোন চলে গেছে।

দোতলার বারান্দায় চলে গেলাম আমি, সিকদার স্যার আর সুধির। সুধির হলো এখনকার লোকাল থানার ইনচার্জ। আমার সাথে ভালো সম্পর্ক ওর।

যাইহোক লাশের কাছে গেলাম। চেয়ারে বসা, টেবিলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মুখ দিয়ে সাদা ফেনা বের হয়েছে, দাগ হয়ে আছে। টেবিলের উপরে একটা থালায় একটা ছেঁড়া তুন্দুল, করলার সবজি আর সরিষার চাটনি একটা কাগজের বাটিতে। দেখে মনে হচ্ছে সবজি দিয়ে প্রায় অর্ধেক তুন্দুল খেয়ে সবে চাটনি মুখে দিয়েছে। কারণ মুখে এখনও অর্ধেক চিবানো তুন্দুল এর টুকরো দেখা যাচ্ছে।

আমরা লাশ দেখে বারান্দাটা চোখ বুলিয়ে নিচে নেমে এলাম আর লাশ পোস্ট মর্টারমের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো। নিচে নেমেই স্যার আগে ডেকে পাঠালো পুরোনো চাকর রামুকে। রামুর

চোখে মুখে ভয় আর চোখের নিচে জলের ছাপ। এসেই বলতে লাগলো, স্যার আমি কিছু জানি না আমাকে ছেঁড়ে দিন।

স্যার এক ধমক দিয়ে, এই থামো তো। শুধু কিছু প্রশ্ন করব উত্তর দাও।

- জ্বী স্যার, বলুন।

- ডা. দত্তের খাবার কোথা থেকে আনা হয়েছে?

কাঁপা গলায় বলল, ডাক্তার বাবুর প্রতিদিনের অভ্যাস হলো ভোর সকালে উঠে আধ ঘন্টা পার্কে হেঁটে ফেরার সময় আব্দুলের দোকান থেকে খাবার নিয়ে আসা। আর কখনও যদি না যায় তখন আব্দুলই পাঠিয়ে দেয়।

- তা আজ কি ডাক্তার হাঁটতে গেছিলেন?

- না স্যার, আজ মেঘলা জন্য আর বের হননি বাবু। কিন্তু আজকে বাবু আমাকে খাবার আনতে বলার আগেই একটা লোক এসে আব্দুল এর কথা বলে খাবার গেটে দিয়ে গেছে আটটা নাগাদ। বাবু প্রতিদিন সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট করেন।

- কি বললে! একটা লোক এসেছিল? কেমন দেখতে সে? দেখলে চিনতে পারবে?

- স্যার, আমি তো অতো ভালো করে খেয়াল করিনি। তবে গালে চাপ দাঁড়ি আর মাথায় সাদা ক্যাপ ছিল। আর গায়ে লাল টি শার্ট। খাবার টা হাতে দিয়েই ঘুরে সোজা চলে যায়।

আমরা যা বোঝার বুঝে গেলাম এ থেকেই। এখানেও চাপ দাঁড়ি, সাদা ক্যাপ আর লাল টি শার্ট। এর আগের দুটো খুনেও এমন একজনকে দেখেছে কেউ না কেউ। তবে কেউই পুরো চেহারা দেখতে পারেনি। বাইরে সিসিটিভি আছে ঠিকই তবে ক্যাপের জন্য মুখের উপরের অংশ সবসময়ই ঢেকে থাকে।

আমি আর সুধির বাইরে বের হয়ে পাশের চায়ের দোকান থেকে দুটো চা নিয়ে খেতে খেতে কথা বলতে লাগলাম। আর সিকদার স্যার একা একটু পুরো বাড়ি আর আশপাশ টা ঘুরে দেখতে লাগলেন। উনি নিজে একাই একবার করে পুরো স্পট টা চেক করেন, এটাই ওনার অভ্যাস।

এতো দিন পর্যন্ত কেস গুলো লোকাল থানাতেই ছিল। উচ্চপদস্থ মহলে

শোরগোল উঠেছিল বটে তবে গোয়েন্দা বিভাগ পর্যন্ত গড়ায়নি। তাই বাকি দুটো জায়গার লোকাল থানায় কল করে ফাইল গুলো দিয়ে যেতে বললাম অফিসে।

ফোনটা রেখে চায়ে চুমুক দিতেই সুধির বলে উঠলো, স্যার, মনে তো হচ্ছে এটা কোনো সিরিয়াল কিলিং এর ঘটনা। একই ভাবে তিন তিনটে খুন একই লোককে বারবার স্পটে পাওয়া।

-আমার মাথায়ও তো সেটাই ঘুরতেছে রে সুধির। দেখা যাক অফিসে গিয়ে তিনটা কেসের মধ্যে কোনো কানেকশন খুঁজে পাই কিনা। কারণ তিনজনই একদম ভিন্ন তিনজন লোক।

কথা চলতে চলতেই চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিতেই দেখলাম সিকদার স্যার বের হয়ে আসলেন। সুধির বিদায় নিয়ে চলে গেলো। স্যার শুধু বললেন যে পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটা দ্রুত পাঠিয়ে দিতে আর অন্য লোকাল থানার ইনচার্জদের সাথে কথা বলে যদি কোনো ক্লু পাওয়া যায় জানাতে।

সুধির চলে গেলে আমি স্যারকে বললাম, বাইকে উঠুন।

স্যার উঠতেই ফাঁকা গলি খুঁজে রতন দা'র দোকানে এসে বসলাম। বসেই পুঁটিকে বললাম দুটো স্পেশাল চাটনি পরোটা দিয়ে যা তো।

স্যার বলল, আগে খেয়েনি তারপর আমি বলব। ততক্ষণ বলো কি বুঝলে।

- স্যার দেখে তো মনে হচ্ছে কেউ রিভেঞ্জ নিচ্ছে। না হলে একই প্যাটার্নে এমন র‍্যানডম ভাবে তো আর খুন হওয়ার কথা না। কিছু তো একটা ব্যাপার আছেই। না হলে রহমতের ছেলে, বিচারক আরমান আর এবার ডা. দত্ত! কিছু তো একটা কানেকশন আছে এদের মধ্যে। আর খুনগুলোও করা হচ্ছে যথেষ্ট সময় নিয়ে...

পুঁটি এসে খাবার দিয়ে যেতেই স্যার খাওয়া শুরু করে দিলেন। সাথে আমি দ্রুত খেতে লাগলাম। খুব খিদে পেয়েছে। খাওয়া শেষে একটা কড়া কফি খেয়ে উঠে পড়লাম। বাইক নিয়ে সোজা অফিসে। এতক্ষণ একটা কথাও বললেন না স্যার। মনে মনে কি যেন ভাবছেন।

রুমে ঢুকে দেখলাম টেবিলে দুটো কেস ফাইল পড়ে আছে। স্যার চেয়ারে বসে

পড়ে চোখ বুলাতে শুরু করলেন। তখনই সুধির ফোন করল।

- স্যার, একটা দারুণ খবর পেয়েছি। ডা. দত্ত নাকি রহমতের কাছের লোক। আর বিচারক আরমান ওর বন্ধু, তাই আরমানের খুনের খবর পেয়ে লোকাল থাকায় গিয়ে চিল্লাচিল্লি করেছিল খুব। ওই থানাতেই ওর ছেলের কেস টাও ছিল। কোনো সমাধান তো হয়নি প্রমাণের অভাবে ওটারও।

- আচ্ছাহ ঠিকাছে বুঝতে পারছি। তুই এক কাজ কর। লোকাল থানায় তো কথা বলছিসই। এই তিন জনেরই গত একবছরের ইতিহাসের খোঁজ করতো। এমন কোনো বড় ঘটনা আছে নাকি যা নিয়ে তিন জনের নামই সামনে আসছিল। .....

- আচ্ছাহ ঠিকাছে খোঁজ নে, রাখলাম।

- কি, সুধির ফোন করছিল? কি বলল, রহমতের ছায়ায় থাকা সব লোক খুন হচ্ছে নাকি?

এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে বোর্ডে মার্কার দিয়ে পয়েন্ট সাজাতে শুরু করলেন স্যার। আর আমাকে বললেন কেস ফাইলে চোখ বুলাতে।

কেস ফাইল ০১: (সংক্ষিপ্ত)

রবিন শেখ। রহমত শেখের পুত্র। ১১ জানুয়ারি রাত দশটায় হোটেল রেড রুফে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ পটাশিয়াম সায়ানাইড বিষ। রেড ওয়াইনের গ্লাসে বিষের চিহ্ন পাওয়া গেছে। আর গ্লাসে রেড ওয়াইনের মধ্যেই পাওয়া যায় একটা ছোট লাল রঙের মাটির বল, যাতে বিষ লাগানো ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। কোনো ধরনের হাতের ছাপ বা এমন কোনো ডিএনএ স্যাম্পল পাওয়া যায়নি যেখান থেকে খুনী পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে। ক্লু শুধু ওই কয়েকটা জিনিস, লাল বল, পটাশিয়াম সায়ানাইড, চাপ দাঁড়ি, সাদা ক্যাপ, লাল টি শার্ট। এছাড়া কোনো চিহ্ন নেই খুনীর। কেউই মুখ ঠিক করে দেখতে পারেনি এমনকি সিসিটিভিও না!

কেস ফাইল ০২: (সংক্ষিপ্ত)

মোঃ আরমান। রহমতের বন্ধু। জর্জ কোর্টের বিচারক। ৯ মার্চ সকাল নয়টায় নিজের বাসা, মতি মঞ্জিলে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ ওই পটাশিয়াম সায়ানাইড। এবারে কমলার রসের গ্লাসে বিষের চিহ্ন। আর কমলার রসের মধ্যে একটা ছোট কমলা রঙের মাটির

বল। আর আবার বর্ণনার লোক তাছাড়া বাড়তি একটা তথ্যও নেই।

আমি ফাইলে চোখ বুলানো শেষ করে সামনে বোর্ডে তাকিয়ে দেখি বোর্ড ভর্তি পয়েন্টে। অনেক গুলো অংশ দাগ টেনে মার্ক করা। আর রবিন, আরমান, দত্তের ছবি বোর্ডে পিন করা। আমি বললাম, এভাবে চিন্তা করলে তো স্যার, রহমতের উপর কেউ প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে মনে হচ্ছে। প্রথমে ছেলে তারপর বন্ধু এরপর এখন কাছের মানুষ।

- কিন্তু কথা হলো কেনো? আর যদি প্রতিশোধই শুধু নিতে চাবে তাহলে রহমতকে মারলেই পারতো।

- সেটাই তো স্যার, রহমতকে না মেরে ওর সব কাছের মানুষকে মারছে কেন? অবশ্য রহমত যে খুব সিধে মানুষ তা তো নয়।

- রহমত হলো জাত ঘুঘু। ওর ছেলে আর বন্ধু খুন হবার পর অনেক হাঙ্গামা করেছিল। কিন্তু পুলিশ বা ওর লোক কিছুই খুঁজে পায়নি।

- সব সমাধান কি আর গায়ের জোরে হয় স্যার! কিছুর জন্য তো মাথাও লাগে।

ঠিক এই মাথা দিয়েই তো এই খুনী খেলছে। একটা বিষয় লক্ষ্য করেছ কি? প্রতিটা খুন কতো সময় নিয়ে করা হয়েছে?

- জ্বী স্যার, প্রথমটা করার এক মাস পর দ্বিতীয়টা, এরপর তো দুই মাস পর তিন নাম্বারটা!

- ফরেনসিকে খোঁজ নাও তো এবার কোনো বল পাওয়া যায়নি?

কথা মতো ফোন দিলাম। কথা বলা শেষে,

- স্যার, এবার সর্ষের মধ্যেই ভূত।

- আমিও সেটাই ভাবছিলাম।

- কিন্তু স্যার, এই রঙিন বলের বিষয়টা তো বুঝলাম না।

- আমিও সেটা বোঝার চেষ্টা করছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই খাবারে বিষ আর একটা রঙিন বল।

- প্রথম কেস, লাল পানিতে লাল বল। দ্বিতীয় কেস, কমলার রসে কমলা বল। আর তৃতীয় মানে এবারে সরিষার চাটনিতে হলুদ বল।... ....স্যার খাবারের সাথে রঙের একটা অদ্ভুত

মিল আছে না?

- এক্স্যাক্টলি। যে রঙের খাবারে বিষ সেই রঙের বল। কিন্তু কথা হলো কেনো?

আমি চুপ করে বসে ভাবনার জগতে ডুব দিলাম।

স্যার বললেন, এভাবে ঝিম মেরে ডুব মারলে হবে না। উঠে পড়ো।

উঠে বললাম, কোথায় যাবেন স্যার?

- আরে আব্দুল এর দোকানে তো ঢোকাই হলো না। এরপর তুমি যাবে রেডরুফে খবর নিতে আর আমি যাবো বিচারকের বাড়ি। শুধু শুধু বসে থেকে লাভ নেই। আসল যায়গায় একবার নিজেদের যেতে হবে।

বলেই স্যার বেরিয়ে পড়লেন। স্যার গাড়িতে আমি বাইকে। কারণ এরপর দুজন দুদিকে।

আব্দুলের দোকানের সামনে আসতেই দুপুরের খাবারের ভিড় চোখে পড়ল। এক তলা বড় রেস্তোরাঁ বটে।

স্যার সোজা গিয়ে টেবিলে বসে সাদা ভাত, রোস্ট আর সরিষার চাটনি অর্ডার করলেন।

আমি বললাম, স্যার ইনভেস্টিগেশন এর আগেই খাওয়া।

বললেন, আগে পেট পুজো তারপর কেস পুজো।

আমিও হেসে ভাত আর মুরগী বলে দিলাম।

একটু পরে এসে ওয়েটার খাবার দিয়ে গেলো আর বলল, স্যার, সরিষার চাটনি তো শুধু সকালে আর সন্ধ্যায় হয়। এখন তো নেই।

স্যার গরম চোখে তাকিয়ে বললেন, মালিককে ডাকো।
ওয়েটার হচকচিয়ে গিয়ে বলল, জ্বী স্যার?

কানে শুনতে পাও না? মালিককে ডাকো।

এবার বেচারা ক্যাশিয়ারকে ডেকে আনলো দেখলাম।

বলুন স্যার, কোনো সমস্যা?

- আপনি আব্দুল?

জ্বী স্যার, আমি আব্দুল। এখানকার ক্যাশ সামলাই। আমার চাচাতো ভাই মালিক।

- তা সরিষায় বিষ দিয়ে মানুষ মারার কারবার কতোদিনের?

এবার অবাক চোখে আব্দুল তাকিয়ে, আরে আজব মশাই তো আপনি! এসব কি যা তা বলছেন...

- বেশি অবাক হবার কিছু নেই। আমি ইন্সপেক্টর সিকদার, (কার্ড বের করে দেখিয়ে) গোয়েন্দা বিভাগ মোহনবাগান। এবার মানে মানে ঝেরে কাশুন তো মশাই।

- স্যার সত্যিই বলছি, (এবার কাঁদো কাঁদো অবস্থায়) আমরা কিছু করিনি। আমাদের এখানকার চাটনির যথেষ্ট সুনাম আছে প্রতিদিন হাজার মানুষ নিয়ে যাচ্ছে, বসে খাচ্ছে। আজ পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পর্যন্ত আসেনি আর আপনি বলছেন মানুষ মারার কথা!

- ডা. দত্তকে চিনতেন?

- কি বলছেন স্যার, চিনবো না কেনো! উনি তো আমাদের রোজ সকালের প্যাকেট কাস্টমার । আজকে আসেননি জন্য খাবার পাঠাতেই যাচ্ছিলাম তখনই এক লোক এসে ডাক্তারের নাম করে খাবার নিয়ে গেলো।

- আর আপনিও সুযোগ বুঝে তাতে বিষ মাখিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

- সত্যি বলছি স্যার, মা কাসাম, কিছু করিনি।

- কেমন দেখতে ছিল?

- চেহারা ওভাবে মনে নেই। কারণ কালো হুডি পড়া একজন ছিল। বলতেছিল স্যারের নতুন ড্রাইভার। আর ওই সময়টাতে এতো চাপ থাকে যে অন্য কিছু ভাবার সময় পাইনি স্যার। মাফ করে দিবেন।

- আচ্ছাহ ঠিকাছে ঠিকাছে, আসুন এখন।

এরপর দুপুরের খাওয়া শেষ করে আমরা বেরিয়ে এসে দুজন দুদিকে বেরিয়ে গেলাম। কালকে সকালে অফিসে দেখা হবে একদম।

(চলবে)

ফটোগ্রাফার পর্ব (৩)

আলী রাইহান স্বপ্ন

সোনাবাগ কলেজে আবার আসতে হলো আবীরের সাথে। কিন্তু এবার আমরা দুজনে অতি সতর্কতার সাথে এসেছি। এখন রাত ১১টা। আমরা আবার সেই দালানের ওখানে।পাশের ঝোপের আড়ালে সতর্ক দৃষ্টিতে আমরা। এতক্ষণ পর্যন্ত সব শান্ত আছে কিন্তু এটা কি আসলেই শান্ত পরিবেশ নাকি ঝড়ের আগের শান্ত পরিবেশ? কি হতে চলেছে এবার। আবীর কি সন্দেহ করছে এটা আমি এখনো জানি না। ওকে জিজ্ঞেস করলে খুলে কিছুই বলে না।আমি ভেবে পাচ্ছি না আর কি রহস্য থাকতে পারে সোনাবাগ কলেজের এই দালানে। সবকিছুর তো সুরহা হয়েছে তাহলে আর কি বাকি থাকে। দেখতে দেখতে ১২টা পার হলো। কিছুই হলো না। পোকামাকড়ের ঝিঁঝিঁ ডাক আর ভনভন করা মশার কামড় ছাড়া কিছুই নাই। আমার ধৈর্যের সীমা শেষ হয়ে যখনই আবিরকে কিছু বলতে যাব তখনই একটা কালো মাইক্রো এসে দাঁড়ালো দালানটার সামনে। দুইজন লোক নামলো সেটা থেকে। নেমে চারপাশটা ভালো করে একবার দেখে নিল তারপর দালানটার ভিতরে ঢুকলো। মাদকের চালান ধরার পর এখানে পুলিশ আর কোনো পাহারা রাখেনি। যাইহোক লোক দুইটা দালানের একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আবার সতর্ক চোখে চারদিকে দেখে ভিতরে ঢুকলো। তারপর বের হলো ঠিক আধাঘণ্টা পর। বের হওয়ার সময় তাদের সাথে ছিল দুটো বড় বড় বাক্স । Freezing box এর মতো। বাক্সগুলো মাইক্রোতে রেখে তাড়াতাড়ি ইঞ্জিন স্টার্ট করে তারা বের হয়ে গেল সোনাবাগ থেকে। ওদের বের হওয়ার কিছুক্ষণ পর আবীর আর আমি আস্তে আস্তে শব্দ না করে এগিয়ে যেতে থাকলাম সেই দালানটার দিকে। দালানের ঐ দরজার সামনে আমরা গেলাম যেখানে ঐ দুইজন লোক গিয়েছিলো। আমার কাছে তখনো কিছুই পরিষ্কার নয়। মাদকের চালান বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর আর কি থাকতে পারে এই দালানে যার জন্য এতকিছু হচ্ছে। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে প্রথম দেখাতে সব স্বাভাবিকই মনে হলো। আবীর কিছুক্ষণ ধরে ধ্বংসপ্রায় পুরনো ঘরটা ভালো করে দেখতে থাকলো। হঠাৎ করে সে ঘরের দক্ষিণ কোণের দিকে গেল। সেখানে ইট বালু আর

প্যালেস্তারার স্তূপ জমা হয়ে আছে। স্তূপকে একটু সরাতেই যা হলো তাতে আমার বিস্ময়ের সীমা থাকলো না। স্তূপের নিচে ছোট্ট একটা দরজার মতো! আশ্চর্য এখানে আবার এই লুকানো দরজা থাকবে কেন। আর কি রহস্য লুকিয়ে আছে এই দালানে।আবীর আর আমি দুইজনে মিলে দরজাটা টেনে খুললাম। মোবাইলে *flash light* দিয়ে দেখলাম দরজাটার ঠিক নিচেই একটা সিঁড়ি। আমরা দুজনেই নিচে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথমে আবীর নামলো তারপর আমি। ভিতরে ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার। মোবাইলের *flash light* ই শেষ ভরসা। চারপাশ থেকে কেমন একটা মেডিক্যালের মতো গন্ধ। ফিনাইলের, রক্তের, ইত্যাদির। আমি এদিক ওদিক ফ্ল্যাশ লাইটের স্বল্প আলোতে কি আছে বোঝার চেষ্টা করতেছি তখনই উজ্জ্বল আলোতে পুরো জায়গাটা আলোকিত হয়ে উঠলো। চোখ ধাঁধানো আলোতে একটু পর ভালো করে চোখ মেলে দেখি আবীর সুইচ বোর্ড খুঁজে পেয়ে আলো জ্বেলেছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখি বড় বড় কয়েকটা ফ্রিজার। একটা ফ্রিজারের সামনে গিয়ে ওটা খুললাম। খুলে দেখি সারি সারি ফ্রিজিং কন্টেইনার। আবীর একটা কন্টেইনার বের করে ওটা খুলে দেখলো। ওর চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ।কিরে কি আছে ওটায়? তুই নিজেই দেখ। বলে আমাকে কন্টেইনারটা দিল। কন্টেইনারের ভিতরে দেখতে আমি অবাক আর ভীতি দুটোর মিশ্রণে ওটা ফেলে দিয়ে হাঁপাতে লাগলাম। একি! মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। আমি একটু স্বাভাবিক হয়ে আবীরের দিকে তাকাতে ও বললো, আমি সন্দেহ করছিলাম এখানে শুধু মাদকের কারবার নয় আরও বড় কিছু আছে। উপরের মাদকের কারবার শুধু ধোঁয়াশার একটা কৌশল। কখনোও যদি ভুলক্রমেও এদের গোপন আস্তানার খবর কেউ জানতে পারে তবে যেন উপরের মাদকের চালানটাই ধরা পড়ে আর ওটা দিয়েই যাতে তারা আরো সাবধানে তাদের ব্যবসা করতে পারে। কেননা কালোবাজারে মাদকের মূল্য যেখানে হাজারে সেখানে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মূল্য লাখের অঙ্কে। কিন্তু কিন্তু পুলিশ এখানে আসার পর এটা আবিষ্কার করতে পারে নি কেন? উহু তোকে বললাম না এটা লাখ লাখ টাকার ব্যবসা। এইরকম ব্যবসায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে দহরমমহরম থাকা তো নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। সেখানে একজন ওসি আর কি জিনিস। চল দেরি না করে পুরো জায়গাটা ভালো করে দেখি। কন্টেইনারটা আবার ফ্রিজে রেখে দুজন চারপাশটা দেখতে থাকলাম। ফ্রিজার ছাড়া কয়েকটা শেলফ। ওখানে অনেকগুলো মিনি

ফ্রিজিং বক্স। ওর পাশে হাসপাতালের ওটি টেবিলের মতো কয়েকটা টেবিল। টেবিলে দুই তিনটা মৃতদেহ। ওগুলো দেখে আমার মাথা গুলাচ্ছিলো। আবীর দেখে বললো যেসব লাশ নেওয়ার কেউ থাকে না তার অর্ধেকের জায়গা কবরে হয় আর বাকি অর্ধেকের এদের হাতে। আরো এগিয়ে আমরা একটা কম্পিউটার দেখতে পেলাম। কম্পিউটারে পাসওয়ার্ড দেওয়া। সৌভাগ্যবশত এত দুর্ধর্ষ লোকেরা পাসওয়ার্ড হেলাফেলা করে রেখে গেছে। STRONG।
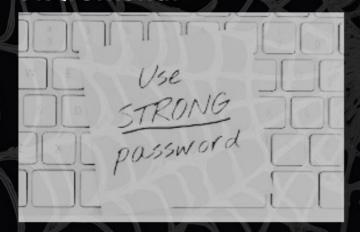
পাসওয়ার্ড বসিয়ে আবীর কম্পিউটারে ঢুকে ফাইলপত্র দেখতে থাকলো। একটা spreadsheet খুলে দেখলো organ trafficking এর বিশাল data। শেষ entry একটু আগের। আরেকটা entry scheduled করা। আজকেরই। আরো ৩ ঘণ্টা পরের। আবীর spreadsheet আর বাকি সব ফাইলের একটা কপি করে নিজের cloud storage এ চালান করলো

কম্পিউটার আগের মতো করে রেখে উঠতেই আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম,এখন আমরা কি করবো! এদের সাথে উর্ধ্বতন লোকেরাও যেহেতু জড়িত তাহলে তো পুলিশে গিয়েও তো কাজ নেই। আবীর মুখে কৌশলী এক হাসি দিয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে বললো, there is always a my friend।

System কলঙ্কিত হলে তাকে override করে সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রশাসন পাশে নেই তবে এটা তো আমাদের পাশে আছে বলে ফোনটা পকেট থেকে বের করলো। তো ফটোগ্রাফার নিজের কাজ শুরু কর। দুজনে মুচকি এক হাঁসি হেঁসে কাজে লেগে পড়লাম। পরিশেষ: পরের দিনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও news portal গুলোতে একটা বিষয় trending ছিল:#Shonarbag College Organ trafficking scandal। তবে এই খবর প্রকাশে কাদের হাত ছিল তা এখনো জানা যায়নি। অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে এটি ছড়ানো হয়। অন্যদিকে নিজেদের বাসায় বসে ফেসবুকে সোনাবাগ কলেজের ঘটনা নিয়ে স্ক্রল করতে করতে দুইজন বেকার বন্ধু হেসে উঠে।

(সমাপ্ত)

THRILLING FACTS

Hijacker Disappears With $200,000

★★★

Air Pirate Bails Out Of Jet Liner

PORTLAND, Ore. (AP) — A hijacker who apparently knew precisely what he wanted to do and how to do it has vanished after bailing out of a commandeered jet airliner with $200,000.

The pilot of the Northwest Airlines Boeing 727 said he believed the hijacker "took leave of us" in the Woodland, Wash., area 25 miles north of here as the plane flew low and slow from Seattle to Reno, Nev., en route to the man's demanded destination, Mexico.

Helicopters and airplanes crisscrossed over the brushy and timbered foothills of the Cascade Mountains most of Thursday before the weather closed in. The hunt resumes today.

Authorities held out little hope, however, that the hijacker would be found soon.

"He's probably long gone," a Clark County, Wash., sheriff's deputy said.

It was the first time an aircraft hijacker had used a parachute to make his escape and it was the largest sum of money an air pirate had ever escaped with in the United States.

Described as a tall, slim man

operate with a static line which rips them open almost immediately after the jumper leaves his aircraft. The sports 'chutes

(See back page, sec. 1, col. 1)

LOCATION OF REAR STAIRWELL: This is a Northwest Airlines Boeing 727 jetliner, of the type hijacked between Portland, Ore., and Seattle Wednesday. Arrow locates position of rear stairwell on plane, which was ordered lowered by the hijacker Wednesday night while the commandeered plane was en route to Reno. The hijacker ransomed the airline and 36 passengers for $200,000, then apparently made an unprecedented hijacking escape by parachute. (AP Wirephoto)

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের এক বিকালে পোর্টল্যান্ড বিমানবন্দর এর আমেরিকাগামী এক বিমানে Dan Copper নামে এক যাত্রী ছিলেন। দেখতে নিরীহ এই যাত্রী পরবর্তীতে যে FBI এর most wanted একজন ব্যক্তি হবে সেটা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। পোর্টল্যান্ড বিমানবন্দর এর আমেরিকাগামী সেই বিমান hijack করে 200,000 ডলার মুক্তিপণ নিয়ে কোন হদিস ছাড়াই লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায় Dan Copper. আজ পর্যন্ত না জানা যায়নি Dan Copper এর পরিচয় না উদ্ধার করা হয়েছে সেই 200,000 ডলার। Dan Copper উরফে D.B.Copper এর কাহিনী আজ পর্যন্ত এক অমীমাংসিত রহস্য।

বৃষ্টি আপা

কানিজ সুমাইতা প্রথা

অফিস থেকে বেরিয়েই রাস্তায় নেমেছি, আজ আর বাসায় ফিরতে মন চাইছে না। তা অবশ্য কখনই চায়না। মায়ের সাথে ঝগড়া হয়েছে। ভালো একটা ছল পাওয়া গেল। ভাবছি কোথায় যাওয়া যায়। দূরে কোথাও। কিন্তু কোথায়?

হুট করে বৃষ্টি আপার কথা মাথায় আসল। বগুড়ার গাবতলী উপজেলার নিশ্চিন্তপুর বলে একটা গ্রামে থাকে শুনেছিলাম। এখন আমাদের সাথে সম্পর্ক নেই বললেই চলে, ছোট থেকে বড়ই হয়েছি তার কাছে। পরে...... সে যাকগে। অনেকদিন ফোন করে ডেকেছিলো, সময়ের অভাবে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আজ সেখানেই যাওয়া যাক। আপা খুব খুশি হবে। নতুন মোবাইল কেনায় আপার নাম্বারটা আর এখানে তোলা হয়নি। ভারী ঝামেলায় পরা গেল তো! শেষ আপার ওখানে গিয়েছিলাম আপার বিয়ের ২বছর পর, মানে বেশ অনেক বছর আগে।

পকেটে মোটে আছে ৪০০ টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা। মাসের শেষ, হাত প্রায় খালি। বাকরখানি আপার খুব প্রিয়। ১ কেজি বাকরখানি নিয়ে যাওয়া যাক, বাকি টাকা যাতায়াতে চলে যাবে। লোকাল বাস পাওয়া গেল। পাক্কা ২ ঘন্টার জার্নি শেষে সন্ধ্যায় পৌঁছালাম নিশ্চিন্তপুরে।

আপার বাড়ির আশেপাশে কোনো বাড়ি নাই, চারিদিকে জঙ্গল। অনেকটা পুরানা বাড়ির মতো। শুনেছিলাম আপার দাদা শ্বশুড় এর আমলের। কতগুলো বছর ধরে টিকে আছে! তবে আপা বেশ সংসারী মানুষ, বাড়িটাকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে বলা যায়।

কিন্তু আজ কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে বাড়িটাকে। কেমন যেন অচেনা।

মেইন গেইট দিয়ে ঢুকেই দরজায় কড়া নাড়লাম। ভদ্রতার খাতিরে দুইবার কড়া নেড়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেক্ষণ হয়ে যায় সাড়া পাওয়া যায়না, একসময় ভেবেই নিলাম ফেরত যাব কিনা।

“ইমন!”

পিছন ফিরেই খানিকটা চমকে উঠলাম। চমকে উঠারই কথা! বৃষ্টি আপা! কোত্থেকে এলো! সদর দরজা খোলার আওয়াজ তো পেলাম না। আশে পাশে পাঁচিল ছাড়া আলাদা রাস্তাও নেই।

"আপাকে তবে এতদিনে মনে পড়লো তোর!" খানিকটা লজ্জিত হলাম বটে।

দুঃখিত গলায় প্রশ্ন ছুড়লাম।

"কেমন আছো আপা?"

"সে যেমন দেখছিস! হাতে কিরে? কি এনেছিস আমার জন্য?"

আমি তাড়াহুড়ো করে প্যাকেটটা আপার হাতে তুলে দিতে দিতে বললাম,"বাকরখানি এনেছি আপা তোমার প্রিয় বলেই...."

কথা শেষ না হতেই আপা প্যাকেট খুলে মুখে ভরতে লাগলো। আপার এমন অস্বাভাবিক আচরণ দেখে একটু ঘাবড়ালাম বটে!

খাওয়া থামিয়ে আপা বললো "ভেতরে চল।"

আশ্চর্য! দরজা খোলাই ছিল। মনে মনে কতগুলো প্রশ্ন নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

ঘরে ঢুকতেই একধরনের তীব্র গন্ধ নাকে লাগলো, অনেকদিন ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখলে যেমন গন্ধ, ঠিক সেরকম।

আপাকে জিজ্ঞেস করতেই বলল, "আমরা তো বেশিরভাগ বাইরে থাকি তাই এমন। সে যাকগে, যা কাপড় ছেড়ে আয়, আমি রাতের খাবার বানাই।"

আমাকে যেই রুমটা দেয়া হলো, সেটা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান, রুমের একটা মাত্র জানালা, তাও মরিচা ধরে গেছে, অনেক চেষ্টায় ও খোলা গেল না। আর দেয়াল গুলো কেমন স্যাতস্যাতে,কিছু কিছু যায়গায় আবার শ্যাওলাও জন্মেছে। সব ঘরের মতো এই ঘরেও সেই বাজে তীব্র গন্ধটা। তবুও কোনো মতে থাকতে হলো।

"খেতে আয় ইমন," খাবার ঘর থেকে আপার ডাক শুনে খেতে গেলাম।

ডাল, আলুভর্তা আর গরুর গোস্ত।

আপা আলুভর্তা দুর্দান্ত বানাতো। আপা যখন ভাত বেড়ে দিচ্ছিলো, আমার চোখ যায় আপার নখের দিকে। নখগুলো কেমন যেন কালচে হয়ে গেছে। খিদের চোটে ওসব আর জিজ্ঞেস করা হলোনা। খাবারগুলোর স্বাদ অন্যরকম লাগছিলো। অনেকদিনের বাসি খাবার যেমন লাগে তেমনি। আপা যে এমন কুৎসিত রান্না করবে তা আমার কল্পনারও বাইরে। খিদের চোটে সবটুকু খেয়ে ফেললাম, স্বাদ নিয়ে গবেষণা আর হলোনা।

" আপা তুমি খাবেনা?"

"আমি তো এখন খাইনা রে, আরো রাত বাড়ুক তখন খাব।"

"আচ্ছা আপা তুমি বাড়িতে একলা যে? দুলাভাই কই?" প্রশ্নটা করতেই আপার মুখ কেমন বেজার হয়ে গেল। "সেকি মুখটা এমন বাংলার পাঁচের মতো করলে যে? ঝগড়া হয়েছে বুঝি?"

প্রশ্নের উত্তর তো পেলামই না, উলটো আপা হনহন করে রান্না ঘরে ঢুকে গেল। মনে মনে একটু লজ্জিত হলাম বটে, এভাবে বলাও ঠিক হয়নি, হয়তো ব্যাক্তিগত দৈব-দুর্বিপাকে আছে।

তবে আগে এমন মজা রোজই করতাম। আপা সম্পর্কে আমার ফুপাতো বোন। পড়াশুনার জন্য শহরে আমাদের সাথেই থাকত। তখন আপার কলেজের গণিত শিক্ষক ছিল দুলাভাই। সাধারণত অংক মাস্টার যেমন হয়- তিনি একদমই তেমন নন। দেখতে রোগামত, আর মোটেও রাগি না, একদম চুপচাপ স্বভাবের। আর আপা হলো বিশ্ব সুন্দরী। কোঁকড়া চুল কোমর ছুঁই ছুঁই করতো তখন। সরু মুখ, টান টান চামড়া, খানিকটা চাকমাদের মত। খোলা চুলে টিপ দিয়ে সালোয়ার-কামিজ পরে যখন কলেজে যেত, সবাই শুধু প্রস্তাব নিয়ে আসত। আপা আমায় কলেজে কত নিয়ে গেছে, পাহাড়া দিতে! আপার বন্ধুরা সবাই মিলে গণিত পড়ত দুলাভাই এর কাছে। আস্তে আস্তে কি করে যেন দুজনের প্রেম হয়ে যায়। কিন্তু কারো পরিবারই কাউকে মেনে নিতে চায় না। কারণ দুলাভাই অন্য ধর্মের। ফুপা ফুপু জানতে পেরে শহর থেকে আপাকে নিয়ে যায় গ্রামে। একরকম ঘর বন্দি করে রেখেছিলো। আমার আম্মা জোড় করে আবার শহরে আনে আপাকে, কারণ আর কদিন বাকি ছিলো আপার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। একদিন সকালে ঘুম ভাঙল ফুপার ভয়ার্ত কণ্ঠে। বাইরে গিয়ে দেখি আম্মাকে ভীষণ ভাবে বকা হচ্ছে, আপাকে শহরে আনায়। কিন্তু কারণ সেটা নয়, কারণ হলো, আপা এক বিশাল চিঠি লিখে বাড়ি থেকে পালিয়েছে।

চিঠিতে লেখা-

প্রিয় মামি,
আপনি আমার বরাবরই প্রিয়। তবে আমাকে মাফ করবেন। আব্বু আম্মু আসলে জানাবেন। আমি যেখানে সুখী হব সেখানেই চললাম-

ইত্যাদি ইত্যাদি..

আম্মাকে ফুপা যা নয় তা বলে অপমান করল। মাঝখান থেকে ফুপা ফুপির সাথে আমাদের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গেল। এরপর মাঝে মধ্যেই আপা আমায় কল দিত, দেখতে চাইত। দুলাভাই আমাকে নিতে যেত একটা পার্কে, দেখা করে আবার বাসায় দিয়ে যেত। একবার আম্মার হাতে ধরা খেলাম। আম্মা সব রকম যোগাযোগ বন্ধ করে দিলেন। ততদিনে আপা বগুড়ায় গেলেন শশুরবাড়িতে। তারপরও দাদির মোবাইল দিয়ে কথা বলতাম। আপা করুণা করে বলত, ইমন তোকে বড্ড বেশি মনে পড়ছে রে, দেখার জন্য ছটফট করছে মন টা। তোকে একটু যদি জড়িয়ে ধরতে পেতাম! আমি তখন নিতান্তই ছোট ছিলাম। আপার আবেগ অতো বুঝতাম না। তারপরে এই কত্তদিন পর আপাকে দেখলাম! এখন আর আগের বেশ নেই, কেমন যেন বয়স্কদের মত চেহারা হয়ে গেছে। চাহনিও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আপাদের বিয়ের ১২ বছর হতে চলেছে, কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা নেই। এই নিয়ে অনেক চিন্তা করে আপা, চিন্তার কারণে কতগুলো রোগও বাধিয়ে ফেলেছে।

খাওয়া শেষ করে ঘরে চলে এলাম। আপা বলল, ঘুমুতে যা, আমার কতগুলো কাজ সেরে তারপর ঘুমুতে হবে। খাটে শুতে গিয়ে দেখি ধুলো ময়লার স্তর জমে গেছে। আপারও বলিহারি ভাই এসেছে আর একটু ঘরগুলো গুছিয়ে দেবেনা! কেমন যেন আচরণ করছে আমার সাথে, একটাবারও খোঁজ নিল না আমার। আমার কথা বাদই দিলাম, নিজের মা-বাবার? আম্মার? আবার আমার সাথে ঠিক মতো কথাও বলছেনা। আপা তো এমন ছিল না কখনো!

বিছানা ঝাড়ার জন্য ঝাড়ু আনতে গেলাম আপার কাছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! পুরো বাড়িতে কোথাও আপাকে পেলাম না। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বেরিয়ে খোঁজ করতেই ঘরের আবছা আলোয় যেই দৃশ্য চোখে পড়ল, তার জন্য কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিলাম না। চোখ কপালে ওঠার মত অবস্থা। আমার পুরো শরীর ক্রমশ কাঁপছে, চিকন ঘাম ছুটছে। আমার ঠিক একশো গজ দূরে আপা। বিশাল একটা মরা গরু দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে মুখে ভরছে, এরপর চিবিয়ে খাচ্ছে, কাঁচা গোস্তের রক্ত ঠোঁটের এককোনা দিয়ে টপ টপ করে পড়ছে। খাওয়ার সময় কেমন একটা বিশ্রী শব্দ বেরোচ্ছে। চেহারাও কেমন যেন হয়ে গেছে। আপার রাশি খারাপ তা জানতাম, কিন্তু এসব কি! স্বপ্ন দেখছি মনে হচ্ছে। আমার মাথায় তখন একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, কি করে পালানো যায়।
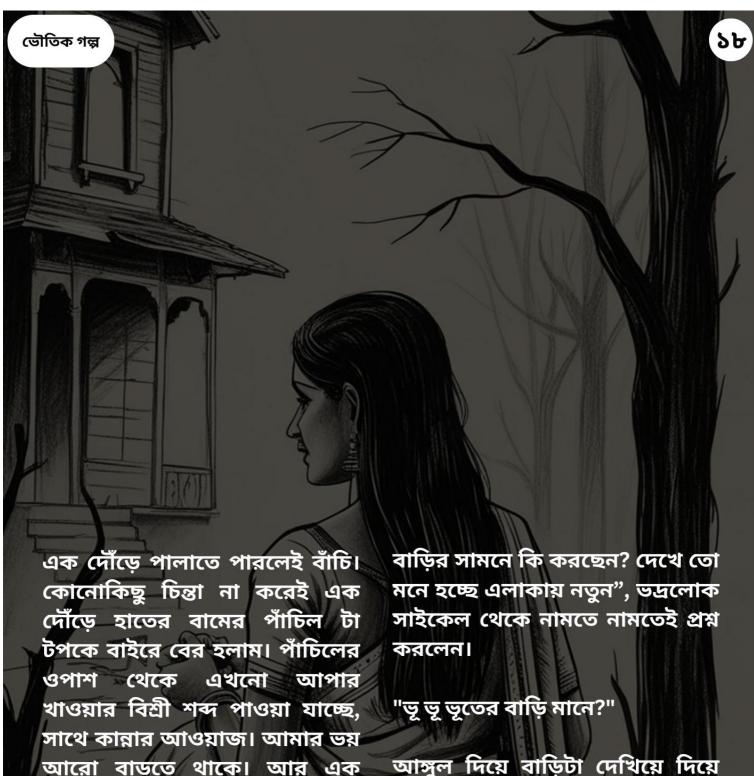
এক দৌঁড়ে পালাতে পারলেই বাঁচি। কোনোকিছু চিন্তা না করেই এক দৌঁড়ে হাতের বামের পাঁচিল টা টপকে বাইরে বের হলাম। পাঁচিলের ওপাশ থেকে এখনো আপার খাওয়ার বিশ্রী শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, সাথে কান্নার আওয়াজ। আমার ভয় আরো বাড়তে থাকে। আর এক মুহুর্ত না, এখনি বাড়ি ফিরব, এই বলে উঠে যখনই একটা দৌড় দিতে যাব তখনি সংঘর্ষ এক ভদ্রলোকের সাথে। তিনি ছিলেন সাইকেলে, ভাগ্যিস ব্রেক কষেছিলেন নয়তো কেলেঙ্কারি বেধে যেত।

“আপনি কে মশাই? এত রাতে ভূতের বাড়ির সামনে কি করছেন? দেখে তো মনে হচ্ছে এলাকায় নতুন”, ভদ্রলোক সাইকেল থেকে নামতে নামতেই প্রশ্ন করলেন।

"ভূ ভূ ভূতের বাড়ি মানে?"

আঙ্গুল দিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ এই বাড়িকে সবাই ভুতের বাড়ি বলে।"

“মানে? কেন?”

"আজ থেকে ৯ বছর আগে প্রবীর রায় মানে, এ বাড়ির মালিক রবী রায় এর ছেলে, বিয়ে করে কোন

এক মুসলিম মেয়েকে, কিন্তু রবীদা কিছুতেই মেনে নেন না এই সম্পর্ক। এরপর রবীদা এবং তার স্ত্রী মারা যাবার পর প্রবীর মেয়েটিকে নিয়ে এখানে ওঠে। বিয়ের ২ বছরে প্রবীর জানতে পারে মেয়েটির মা হবার সম্ভাবনা নেই। প্রবীর তখন আরেকটা সম্পর্কে জরিয়ে পরে এবং মেয়েটিকে তালাক দেবার কথা বলে। মেয়েটি এ খবর শুনে একদিন রাতে বিষ খেয়ে সেখানেই তৎক্ষনাৎ মারা যায়। সেই রাতেই প্রবীর লাশ রেখে সবাইকে খবর দিতে বাইরে বেরোয়, কিন্তু বাড়িতে ফিরে গিয়ে আমরা দেখি লাশ নেই! এ পুলিশ থেকে ও পুলিশ কত খোজাখুজি লাশ কোথাও নেই এবং এখনো নিখোঁজ। এরপর কেউ এই বাড়িতে আর থাকতে পারে নি। প্রবীরকে রোজ রাতে জ্বালাতন করত মেয়েটির আত্মা, সে ও বাধ্য হয় এ বাড়ি ছাড়তে। তখন থেকে এখানে প্রতিরাতে কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায়। এবং প্রতিমাসে এই তারিখে মানে মেয়েটির মৃত্যুদিনে গ্রামের যেকোনো একটা গরু চুরি হয়। পরেরদিন সকালে আবার পাচিলের এই পাশে হাড়-হাড্ডি পরে থাকে......"

ভদ্রলোক তার মতো করে বলেই যাচ্ছেন। কিন্তু আমার কাছে একটা জিনিস এই মুহুর্তে স্পষ্ট হয়ে গেল। বৃষ্টি আপা বেঁচে নেই, না জানি কত কষ্ট নিয়ে আপা এ পৃথিবী থেকে চলে গেছেন, তার আত্মা হয়ত শান্তিতে নেই। শেষ যেই চিঠিতে আপা লিখেছিল, "যেখানে সুখ সেখানেই চললাম"। কিন্তু আপা তো সুখে ছিল না! বাড়ি গিয়ে আমি কি জবাব দেব? কিন্তু কয়েক ঘন্টা আগেই আমি যার সাথে গল্প করছিলাম, খাবার খাচ্ছিলাম সেসব কি ছিলো? আর কিছুক্ষণ থাকলেই... আমার কিছু হয়ে যেত না তো? হয়তো না, আপা যে আমায় বড্ড বেশি ভালো বাসতো, আগে রোজই বলত, "ইমন আমার থেকে বেশি কে তোকে ভালোবাসবে!"

এখনো পাঁচিলের ওপাশ থেকে আপার কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, আমার নিজেরো চোখ শীতল ততক্ষণে, তবুও কতগুলো প্রশ্ন নিয়ে বাড়ি ফিরছি, আচ্ছা এমনও কি ঘটে?

SPICE OF THRILLER

Government Communications Headquarters (GCHQ) হল যুক্তরাজ্যের একটি গোপন গোয়েন্দা সংস্থা যা বিশ্বব্যাপী সাইবার নিরাপত্তা এবং গোপন তথ্য সংগ্রহে বিশেষজ্ঞ। এই সংস্থা শক্তিশালী কম্পিউটার প্রযুক্তি ও ক্রিপটোগ্রাফি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশ এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মধ্যে চলমান যোগাযোগ পর্যবেক্ষণ করে।*GCHQ*-এর প্রযুক্তি এত শক্তিশালী যে, এটি আপনার স্মার্টফোনের মাইক্রোফোন বা ক্যামেরার দখল নিতে পারে।*GCHQ* এতটাই গোপনীয় কাজ করে যে তাদের সদর দফতরের ডিজাইনও এমনভাবে করা হয়েছে যাতে এটি আকাশ থেকে নজরে না আসে! *GCHQ*-এর কর্মীরা প্রতি মুহূর্তে এমনসব তথ্যের সঙ্গে কাজ করেন যা দেশগুলোর ভবিষ্যত বদলে দিতে পারে!তাদের প্রধান ভবন একটি পরমাণু বাংকারের মতো নির্মাণ করা হয়েছে, যা আশেপাশের দৃষ্টি থেকে পুরোপুরি আড়ালে। *GCHQ* একবিংশ শতাব্দীর গুপ্তচরবৃত্তিতে বড় এক খেলোয়াড় যে মুহূর্তেই বদলে দিতে পারে যেকোনো ধরনের পরিস্থিতি।

অন্য আমি (৩য় পর্ব)

আশরাফুল ইসলাম

ঘড়িতে ১০: ৫৬ বেজে গেছে।

তড়িঘড়ি করে বাসা থেকে বের হয়ে ভাগ্যিস ভার্সিটির এক ছোট ভাইয়ের বাইক দিয়ে আসা গেল। সে ও প্রোগ্রামে যাবে। নয়তো অনেক দেরি হয়ে যেত।

ভার্সিটিতে পৌঁছে দেখি সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে। কি নিয়ে যেন বলাবলি করছে। দূর থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে নাহ। কাছে যেতেই সবাই চুপ।

আমি যাওয়ার পর দেখলাম একজন মিট মিট করে হাসতেছে। তার নাম অন্যন্যা। পুরো নাম অন্যন্যা চৌধুরী। বড় লোকের বাবার একমাত্র মেয়ে। সে চাইলে দেশের বাহিরে পড়াশোনা করতে পারতো, কিন্তু বিদেশে নাকি তার ভালো লাগে না। ভার্টিটিতে আসার কিছু দিন পর থেকেই তার মূখ্য কাজ ই হচ্ছে আমার পেছনে লাগা আর কখন কি করি সেটার নজরদারি করা।

তো, জিজ্ঞেস করলাম, কিরে সবাই যে যার কাজ রেখে এভাবে হাত গুটিয়ে বসে আছিস কেন?

সুভাষ বলল, আবিদ ভাইয়া একটা ঝামেলা হয়ে গেছে।

আমি রাগান্বিত স্বরে বললাম, আজকে প্রোগ্রাম আজ কিসের ঝামেলা? তোদের না বলেছি প্রোগ্রাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন ঝামেলা যেন না হয়।

সুভাষ বলল, না ভাইয়া অন্যদের সাথে ঝামেলা নাহ। হয়েছে অন্য আরেক টা। কি করব বুঝতে পারছি না।

এরই মধ্যে প্রিন্সিপাল স্যারের ফোন।

আবিদ: আস্ সালামু আলাইকুম স্যার। কেমন আছেন?

প্রিন্সিপাল স্যার: আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তোমার শরীর কেমন? তোমার মা ও বাবা দুজনেই ফোন করেছিলো শুনলাম গতকালকে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেছো। তোমাকে কতবার বলি নিজে এত কাজের চাপ নিও না অন্যদেরকেও কাজে লাগাও। তাদের ও দায়িত্ব নেয়া উচিত।

আবিদ: (মনে মনে বলল, বাবা ফোন করেছে....)। জ্বি স্যার, তাই করছি।

প্রিন্সিপাল স্যার: ঐ দিকের গোছানো

কতদূর? প্রধান অতিথি ২ টার সময় আসবেন বলেছেন। আমাদের অনুষ্ঠান যথা সময়েই শুরু করতে বলেছেন।

আবিদ: এই তো স্যার প্রায় শেষের দিকে।

প্রিন্সিপাল স্যার: গুড বয়। আসলে তোমাকে ছাড়া এত বড় প্রোগ্রাম করা অসম্ভব ই বলা চলে। ঠিক আছে, তুমি শেষ করে আমাকে জানিও আমি সবাইকে নিয়ে চলে আসব। আর কোন সমস্যা হলে আমাকে সাথে সাথে জানাবে।

আবিদ: ঠিক আছে স্যার।

লাইন কাটার পর, সুভাষ বল কি বলতেছিলি।

ভাইয়া ঝামেলা হয়েছে দুইটা। যে উপস্থাপনা করবে সে হঠাৎ করে কাল রাত থেকে অসুস্থ। সে কোন ভাবেই আসতে পারবে না।

আবিদ: আমাকে তো জানালো না, তুই ও তো কিছু জানালি না।

সুভাষ: ভাইয়া সে আপনাকে ভয়ে ফোন করে নি। (আবিদ মনে মনে হাসলো, তার বেশ রাগ আছে, তাই বলে সবাই এতটা ভয় পায় সেটা জানা ছিলো না)। আর আমি আপনাকে দুই বার ফোন আর মেসেজ ও করেছিলাম।

আমি ফোনে তাকিয়ে দেখি সত্যিই সুভাষের ২ টা মিসকল আর মেসেজ। আমি এটা খেয়াল করলাম না কেন। ফোন তো সাথে ই ছিলো।

আচ্ছা বল আরেকটা কি সমস্যা।

সুভাষ: ক্যামেরাম্যান ঐ বাজেটে ছবি তুলে দিবে না এখন আজকে সকালে আরো বেশি টাকা চাইছে।

আবিদ রেগে গিয়ে, মানে কি.? উনাকে সব বলে কনফার্ম করিস নি?

সুভাষ: বলেছি কিন্তু সকাল থেকেই মেয়েরা ছবি তুলছিলো। তখন এসে বলে এত ছবি সে তুলতে পারবে না।

আবিদ: ভার্সিটির প্রোগ্রামে ছবি তুলবে না তো কখন তুলবে। ব্যাটাকে ধরে নিয়ে আয় দেখি কি বলে।

সুভাষ: সে না বলেই চলে গেছে। এখন ফোনও বন্ধ।

আবিদের শরীর রাগে গজ গজ করছে। সাথে খিদেও পেয়েছে।

আবিদ সুভাষ কে ডেকে বলল, বাকি সব ঠিক আছে?

সুভাষ বলল, হ্যাঁ।

তাহলে তুই আমার সাথে থাক আর বাকিরা যাও আর ঐ দিকটা সামলাও। আমি এ দুটার সমাধান করে আসছি।

সবাই চলে গেলেও অন্যন্যা গেল না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

কি ব্যাপার, তুমি যাচ্ছো না কেন.? যাওয়ার জন্য কি ফোনে মেসেজ দিতে হবে?

অন্যন্যা ভেংচি কাটলো আর মনে মনে ভাবলো, জীবনে একটা মেসেজের যে রিপ্লাই দেয় না আবার সে দেবে এমনি মেসেজ। শয়তানের হাড্ডি।

আবিদ: ল্যাম্পপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে আছো, কি বলছি কথা কানে গেছে.?

অন্যন্যা: হ্যাঁ, একটা কথা বলার ছিলো.?

আবিদ: দেখ এখন কথা বলার সময় নাহ। দেখেছো তো ঝামেলা হয়েছে। কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো।

অন্যন্যা: এত চিন্তা করলে চলে.? ঝামেলা মিটবার আমার কাছে একটা উপায় আছে, যদি শুনতে ইচ্ছে হয় তাহলে বলব। নয়তো আমি গেলাম (একটু রাগ দেখিয়ে)।

আবিদ: সমাধান আছে তাহলে আমি আসার আগেই তো ঝামেলা মিটানো যেত। আমি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা লাগে না।

অন্যন্যা: নাহ তুমি আসলে বলব তাই আর আগেই ঝামেলা মিটাই দিলে পরে যদি ঐটা না হয় তারপর তো আমায় বকবে। এবং ঝামেলা মিটে গেলে আমার ট্রিট ও পাওয়া হবে নাহ।

আবিদ: এই, তোমার সারাদিন খাওয়া ছাড়া আর কোন কিছু মাথায় থাকে না...? শরীর স্বাস্থ্যের অবস্থা তো শুকনা বাঁশ। এতক্ষনে অন্যন্যার দিকে চোখ পড়লো আবিদের। পরনে হালকা জলপাই রংয়ের তাঁতের শাড়ি। কানে ঝুলছে দুল, এক হাতে ম্যাচিং চুড়ি, আরেক হাতে ব্রেসলেট, ঠোঁটে হাল্কা লিপস্টিক, চোখে কাজল, তার লম্বা চুল গুলো আজ ছড়িয়ে আছে। এমনিতে সে খোঁপা করেই রাখে। আজকে এ সাজে তাকে অপূর্ব লাগছে, যা কোন ভাষায় প্রকাশ করলেও কম হয় যাবে। আবিদের ঘোর ভাঙ্গে অন্যন্যার ডাকে।

অন্যন্যা: কি হলো, আরো কাজ থাকে তো।

আবিদ: কি সেটা শুনি.?

অন্যন্যা: ঐটা বলা যাবে নাহ। মনে মনে আবিদ কে গাধা বলে সম্বোধন করলো।
আবিদ: বলতে হবে না। এবার সমাধান বলো।

অন্যন্যা: আগে বলো সমাধান হলে ট্রিট দিবে.? তাহলে বলবো নয়তো না।

আবির: ঠিক আছে, বলো এবার।

অন্যন্যা: খুশিতে আটখানা হয়ে বলল, উপস্থাপনার জন্য আমাদের ভার্সিটির ১ম বর্ষে একটা মেয়ে আছে, তার কণ্ঠ অনেক সুন্দর। অনেক মিষ্টি করে কথা বলে। সে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে।

আবির: সেকি আগে কোথাও উপস্থাপনা করেছে?

অন্যন্যা: না করেনি। বাট আমার বিশ্বাস সে পারবে।

আবির: পাগল হলো নাকি। সে এর আগে কোথাও করে নি। তার উপর এটা বড় প্রোগ্রাম, একটু উল্টা পাল্টা হলে আমাদের ডিপার্টমেন্টের মানসম্মান শেষ। তুমি ভেবে দেখেছো একবার।

অন্যন্যা: না সে পারবে তাকে ডাকি তুমি কথা বলো।

অন্যন্যা ফোন বের করে কাকে যেন আসতে বলল।

আবিদ দেখছে একটা নীল রংয়ের শাড়ি পড়া একটা মেয়ে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। কাছে আসতেই আবিদ পুরো হতবাক। হা করে তাকিয়ে আছে। এ যেন অপ্সরা পরী।

এসময় তার শিল্পী আসিফের একটা গান মনে পড়ে গেল।

"নীল নীল নীলাঞ্জনা, চোখ দুটো টানা টানা।
কপালের ই টিপ যেন জোনাকির দ্বীপ,
প্রেমে পড়েছি আমি করনা মানা।"

আবিদ গানের কথা গুলো বুলি আওরাচ্ছে আর তাকিয়ে আছে। আর ঐ দিকে অন্যন্যা তাকিয়ে থাকা দেখে রাগে ভূত হয়ে গেছে।

"আস্ সালামু আলাইকুম ভাইয়া"।

মেয়েটির কথায় আবিদের ধ্যান ভাঙ্গলো।

আলাইকুম আস্ সালাম।

তুমি কী উপস্থাপনা করতে পারবে?

জ্বী ভাইয়া পারব। তবে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে কিছু সময়। স্ক্রিপ্টটা যদি পেতাম ভালো হতো।

সুভাষ, স্ক্রিপ্টটা রেডি না?

হ্যাঁ ভাইয়া রেডি।

তাহলে ঐটা তাকে দে। আর দ্রুত কাজ শেষ কর। অনুষ্ঠান শুরু করার সময় হয়ে গেল। এই তুমি ভালো করে প্র্যাকটিস করো আর কোন কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবে।

পাশ থেকে অন্যন্যা বলে ওঠলো" ওর সাথে আমি আছি। তোমার এত চিন্তা করতে হবে নাহ।

আবিদ: ঠিক আছে। এবার দ্বিতীয় সমাধানটা কি.?

অন্যন্যা: আমার বাবা গত মাসে ব্যবসার কাজের জন্য দেশের বাহিরে গিয়েছিল। আসার সময় আমার জন্য একটা ক্যামেরা নিয়ে আসছে। ভাবছি আমার একজন পরিচিত আর কাছের একজন মানুষ আছে। তার ক্যামেরায় ছবি তোলা শখ তাকে গিফট করব ভাবছি।

তাহলে তাকে ডাকো। ছবিও তোলা হবে, আর তাকেও গিফটও দেয়া হবে।

অন্যন্যা মনে মনে আবারও আবিদকে গাধা বলল। মানুষ টা যে তুমিই সেটা বুঝো নাহ। আস্ত গাধা।

নাহ এখন দেয়া যাবে নাহ। আমি বলছিলাম, তোমার ছবি তোলার হাত অনেক সুন্দর। তাই তুমি ছবি তুলবে। আমি বাসা থেকে আসার সময় ক্যামেরা নিয়ে এসেছি।

আবিদ: পাগল নাকি। আমি কবে ছবি ওঠাই বলো।

অন্যন্যা: সেটা তোমার ফোন দেখলেই বোঝা যায়। আর গতবার স্পোর্টর্সে ক্যামেরাম্যান অসুস্থ হলে বাকি সময় তো তুমিই ছবি ওঠালে।

আবিদ: সেটা ভিন্ন কথা।

অন্যন্যা: আমি সমাধান দিলাম এখন বাকিটা তুমি জানো।

এবার সুভাষ আর নীল শাড়ি পড়া

মেয়েটা এক সাথে বলে ওঠলো। হ্যাঁ ভাইয়া, আপনি হলেই ভালো হয়।

যথাসময়েই অনুষ্ঠান শুরু হলো। ঠিক ২টার সময় প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট শিল্পপতি আনিসুর রহমান চলে আসলেন। তিনি আবিদকে কয়েকবার খবর পাঠালেন কথা বলার জন্য। কিন্তু আবিদ প্রত্যেকবার ই বলে দিল সে ব্যস্ত আছে। আনিসুর রহমান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আবিদ ছবি তোলায় ব্যস্ত। আর তার ফাঁকে নীল শাড়ি পড়া মেয়েটা বার বার চোখের সামনে পড়ছে। মেয়েটি এত সুন্দর উপস্থাপনা করবে আবিদ সেটা কল্পনাও করেনি। এ জন্য অন্যন্যা কে মনে মনে ধন্যবাদ জানালো।

অনুষ্ঠান নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, নাটিকা সব কিছু মিলে চমৎকারভাবে অনুষ্ঠান শেষ হলো। প্রিন্সিপাল স্যার

সহ অতিথি সকলে এত সুন্দর আয়োজনের জন্য আবিদের অনেক প্রসংশা করলেন।

সব কাজ শেষ করে আবিদ বসে রেস্ট নিচ্ছে আর আড্ডা দিচ্ছে। এমন সময় মেয়েটি আবিদের কাছে এসে ধন্যবাদ দিলো আর তার যদি কোন ছবি তোলা থাকে তাহলে তাকে দিতে বলল। আবিদ জানালো যেহেতু অন্যন্যার ক্যামেরা তাই তার কাছেই থাকবে। তার কাছ থেকে যেন নেয়। এবার মেয়েটি বায়না ধরলো তার সাথে সেল্ফি তোলার।

আবিদ না করলেও সকলের জোড়াজুড়িতে সে রাজি হলো। মেয়েটি চলে গেল। যাওয়ার পরে মনে হলো মেয়েটির নাম ই তো জানা হলো নাহ। পেছন থেকে ডাক দিবে সে কেমন দেখা যায়। আচ্ছা থাক পরে জানা যাবে।

এ দিকে অন্যন্যা দাঁড়িয়ে এসব দেখছে তা আবিদ বা মেয়েটি খেয়াল করে নি। অন্যন্যা এসে আবিদের মাথায় টোকা মারলো। আর বলল, ভালোই তো সেল্ফি তোলা হলো। কিসের সেল্ফি? আমি দেখেছি, সব আর উল্টো পাল্টা বোঝাতে হবে নাহ। তো তখন আসলে না কেন।

কেন আসব তোমাদের মাঝে।

আমাদের মাঝে মানে?

ভাবছি।

কি সেটা?

আগে ভাবা শেষ করি তারপর বলবনি।

এখন শুনি।

এটা বলার পর ই রিক্সা হঠাৎ ব্রেক করে। এতে অন্যন্যা পড়েই যাবে কিন্তু আবিদ ধরে ফেলায় সে বেঁচে যায়।

কি ব্যপার মামা, এমন করে কেউ রিক্সা থামায়?

রিক্সা ওয়ালা: রিক্সার সামনে দিয়া হঠাৎ কি যেন একটা দৌড় দিল কিছু বুঝলাম না মামা।

কই আমরা তো কিছু দেখলাম না। রাতে ঘুমাও নি নাকি?

রিক্সা ওয়ালা : না মামা হাচা কথা কইতেছি। কী যেন গেল।

আবিদ খেয়াল করলো পুরো রাস্তা ফাঁকা। রাস্তার এক পাশে আম গাছের নিচে ঐ দিনের লোকটা দাড়িয়ে আছে।

এ লোক এখানে কেন...?

কি চায় সে....

(চ ল বে)

এক রাতে
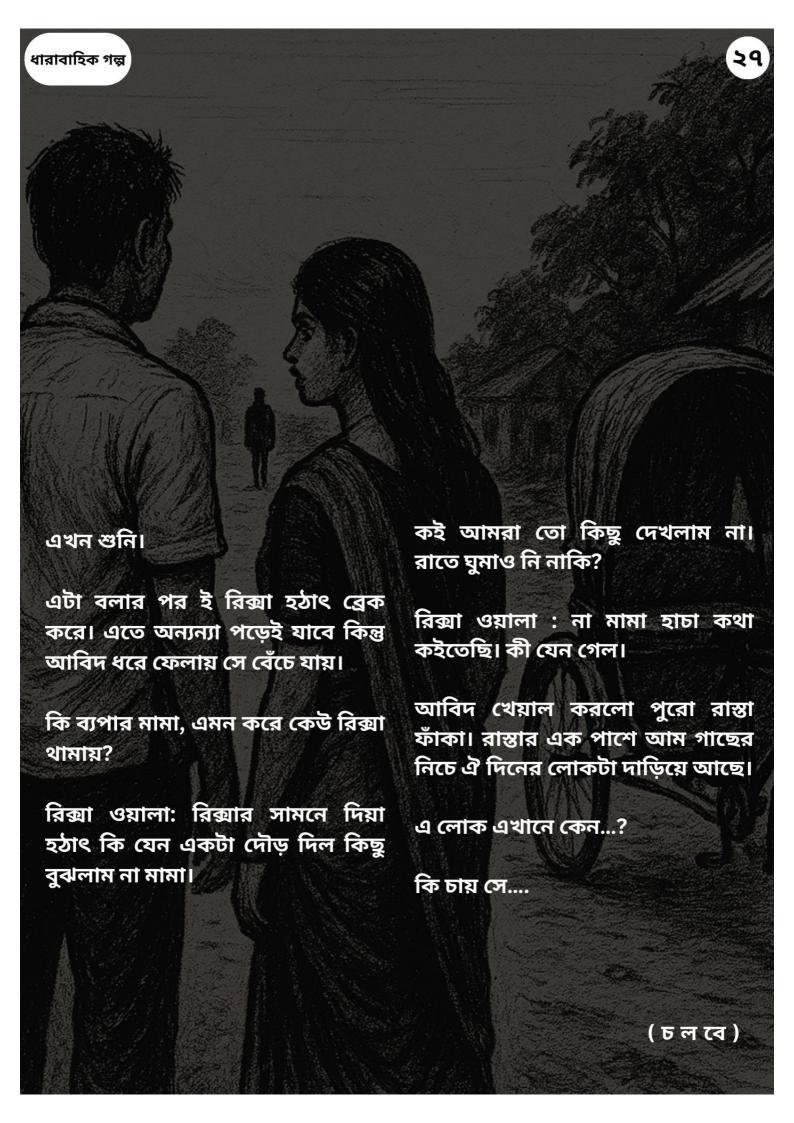
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

এপ্রিল, ১৯৯৯
রাত ১১: ৩০

ঘরটা যেমন অন্ধকার, তেমনই ধোঁয়াচ্ছন্ন।
পুব দিকের জানালার পাশের খাটে শুয়ে আছে আনিস। জানালার পর্দা ভেদ করে বাইরে থেকে সামান্য আলো ঢুকে পড়েছে ঘরে। আবছা আলোয় ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে সে। পরপর দুটো সিগারেট সাবাড় করার কারণে ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘরটা।

ঘরসংলগ্ন বাথরুম থেকে তোয়ালে দিয়ে ভেজা মুখ মুছতে মুছতে বের হয়ে এল কালচে অবয়বের একজন। ঘুমানোর আগে বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধোয়াটা তার স্বভাব।
'সিগারেট...' তোয়ালেটা আলনায় রেখে বলল যুবক।

গত বছর শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকায় নাম ওঠার আগে থেকেই দেহরক্ষী নিয়ে চলাফেরা করে ফেরদৌস। আরও দুজন দেহরক্ষী আছে তার, ওরা সারা দিন থাকলেও রাতে সব সময় আনিসই থাকে। সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলে সেখান থেকে একটা সিগারেট নিয়ে পশ্চিম দিকে নিজের বিছানার দিকে চলে গেল ফেরদৌস।

আনিস জানে এখন কী করবে এই ছেলে। প্রথমে বালিশটা সরিয়ে নিশ্চিত হয়ে নেবে যে সার্বক্ষণিক সঙ্গী পিস্তলটা আছে কি না, তারপর জানালার সামনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সিগারেট শেষ করবে। দরকার না হলে তেমন কোনো কথা বলবে না, ঘুমিয়ে পড়বে। একদম এপাশ–ওপাশ করবে না।

সেটাই হলো। বালিশ সরিয়ে পিস্তলটা দেখার পর জানালার সামনে চলে গেল ফেরদৌস। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আনিস। এটা নিয়েই বেশি ভয় ছিল তার মধ্যে। এখন জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে ফেরদৌস। সাধারণত অর্ধেকের মতো খাওয়ার পর ফেলে দেয়, আজ সেটা করল না। দুই আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা রেখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

"কী হইছে?" প্রশ্নটা না করে পারল না আনিস।

'কিছু না', বলে চিন্তিত মুখে তার সামনে চলে এল ফেরদৌস। তার চোখেমুখে ভড়কে যাওয়ার চিহ্ন স্পষ্ট। সচরাচর

এমনটা দেখা যায় না। 'বাইরে একটা গাড়ি... দ্যাখো তো কাহিনি কী... আমার সন্দেহ হইতাছে!'

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দেহরক্ষী। তাদের জগতে সারাক্ষণই তটস্থ থাকতে হয় পুলিশকে নিয়ে। এর আগে বহুবার পুলিশ-রেইডের শিকার হয়েছে তারা। পুলিশের কারণেই এক জায়গায় বেশি দিন–রাত কাটায় না। বলতে গেলে দু-তিন দিন পরপরই জায়গা বদল করতে হয়। এই যে আজ মিরপুর ১৩ নম্বরের এই তিনতলা বাড়িতে এসেছে দ্বিতীয় দিনের মতো। ধরে নেওয়া যায়, এটাই শেষ রাত। সব দিক থেকে!

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল আনিস। অন্য সব দিনের মতোই রাস্তাটা সুনসান আর নীরব। এখানকার কম বাড়িতেই পার্কিংয়ের সুবিধা আছে। তাই গাড়ির মালিকেরা বাড়ির সামনের রাস্তায় গাড়ি রাখে, তেমনি বেশ কয়েকটি প্রাইভেট কার পার্ক করে রাখা আছে রাস্তার ফুটপাত ঘেঁষে।

'কোন গাড়িটার কথা বলতাছ?' আনিস পেছন দিকে ফিরে তাকাল, কিন্তু আবছা আলোয় দেখতে পেল ফেরদৌস পিস্তল তাক করে রেখেছে তারই দিকে!

'ক্‌-কী হইছে?' ভয়ের একটা শিহরণ বয়ে গেল আনিসের শিরদাঁড়া বেয়ে। বালিশের নিচ থেকে তার নিজের পিস্তলটা কখন নিয়ে নিয়েছে, টেরই পায়নি।

'কার কাছে বেচলা আমারে... নিজেরে?'
প্রশ্নটা অন্য যে কারও কাছে দুর্বোধ্য শোনালেও আন্ডারওয়ার্ল্ডের মানুষজনের কাছে নয়। 'কী কও, তুমি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল আনিস। আবছা অন্ধকারেও ফেরদৌসের ক্রূর হাসিটা দেখতে পেল সে।

'আমার পিস্তল ধরছ তুমি', প্রশ্নের মতো শোনাল না কথাটা।

আরও একবার বিস্মিত হলো আনিস। 'ভাই, তুমি আমারে ভুল বুঝতাছ...এই সব কী কও তুমি?'

'আহ', বিরক্ত হয়ে উঠল শীর্ষ সন্ত্রাসী। 'ক্যান ধরছ?'

আনিস পুরোপুরি ধন্দে পড়ে গেল এবার, কী বলবে বুঝতে পারল না।

'কে কিনল তোমারে... সেভেনস্টার... ফাইভস্টার?' ফেরদৌস বলল। 'নাকি অন্য কেউ?'

চুপ মেরে রইল আনিস। খুব কাছ থেকে দেখেছে, এই ছেলের সবচেয়ে বড় গুণ তার অসম সাহস নয়, বিপদের গন্ধ আগেভাগে আঁচ করতে পারা। এর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সম্ভবত অতিমানবীয় ধরনের। কেমন করে যে বিপদের গন্ধ পেয়ে যায়, আনিস আজও বুঝতে পারেনি, এখনো বুঝতে পারছে না।

‘নিজ থিকা সত্যিটা বললে শাস্তি কম হইব’, ফেরদৌস প্রস্তাব দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল এবার।

দ্রুত ভেবে গেল আনিস। খুব বেশি দেরি করলে ফেরদৌসের মাথা গরম হয়ে যাবে। আর সেটা হলে তার কোনো সুযোগই থাকবে না। এরই মধ্যে তার বুকে হাতুড়িপেটা শুরু হয়ে গেছে। পাঁচ-ছয় বছর ধরে আছে এই জগতে। শুরু থেকেই বড় বড় সব গ্রুপকে টেক্কা দিয়েছে এই ছেলে। তারাও সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে, ওকে ঘায়েল করার জন্য। কিন্তু কয়েক বছরেও সাফল্য পায়নি। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। সম্ভবত তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে গেছে, এখন শুধু কার্যকর করা বাকি। যাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে আজ সে মরতে বসেছে, তাদের কেন রক্ষা করবে? দরকারটাই বা কী! অবশেষে গভীর করে শ্বাস নিয়ে নিল আনিস।

‘সবতে!’

অবাক হলো তার দিকে অস্ত্র তাক করে রাখা যুবক।

‘সবাই মিইল্যা ট্যাকা দিছে।’

ফেরদৌসের মুখে প্রশান্তির হাসি দেখা গেল। তার শত্রুদের এভাবে জোট বাঁধতে দেখে একধরনের গর্ব অনুভব করছে সে। ‘জঙ্গলের সবগুলান জানোয়ার এক হইছে!’ তৃপ্তির সঙ্গে বলল ফেরদৌস। ‘কত টাকা দিছে ওরা?’

ঢোক গিলল মৃত্যুপথযাত্রী। ‘দশ লাখ’। তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ আর ভঙ্গুর।

‘অ্যাডভান্স দিছে কত?’

‘দ্-দুই।’

গভীর করে শ্বাস নিল ফেরদৌস। এই ছেলেকে প্রতি মাসে হাতখরচের জন্য পনেরো হাজার টাকা দেয় সে। এ ছাড়া সময়ে–অসময়ে যখনই দরকার পড়ে, বিশ-ত্রিশ হাজার দিতে কার্পণ্য করে না। এমন সোনার ডিম পাড়া হাঁস মেরে একসঙ্গে এই পরিমাণ টাকা নেওয়ার মতো বোকা আনিস নয়। ‘অন্য কাহিনি আছে। তুমি খালি টাকার জন্য রাজি হও নাই।’

আলতো করে মাথা নাড়ল আনিস। কথাটা অসত্য নয়। 'ওরা কইছে আইজ হোক, কাইল হোক তুমি মরবা...লগে আমিও!'

মুচকি হাসল অস্ত্রধারী। একদিক থেকে কথাটা সত্যি, প্রতিটি জীবিত প্রাণীকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। 'এই টাকা নিয়া তুমি কী করবা?'

ভারী করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল দেহরক্ষী। 'ভাবছিলাম মিডল ইস্টে চইল্যা যামু।' এবার ফেরদৌসের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল। তাদের লাইনে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো এসব পলায়নবাদী লোকজন। প্রতিপক্ষের কাছে সহজ শিকারে পরিণত হয় এরা।

'এইটা কোনো লাইফ না', মাথা নিচু করে আক্ষেপে বলল আনিস। 'সব সময় পলাইয়া থাকতে হয়, ভয়ে থাকতে হয়...আমি আর পারতাছিলাম না!' দুচোখ ভিজে গেল তার।

চুপচাপ শুনে গেল শীর্ষ সন্ত্রাসী ফেরদৌস, যেন তার নিজের অন্তরাত্মা কথাগুলো বলছে। ঘরে নেমে এল কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।

মুখ তুলে তাকাল আনিস। 'আমারে মাফ কইরা দিয়ো, ভাই!' নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ল তার অশ্রু।

'তোমার জানতে ইচ্ছা করতাছে না, আমি কেমনে বুঝলাম?' স্থিরচোখে তাকিয়ে থেকে বলল ফেরদৌস।

এবার ঢোক গিলল দেহরক্ষী। সত্যি বলতে খুব জানতে ইচ্ছে করছে। যেহেতু তার নিয়তি ঠিক হয়ে গেছে, পিতৃদত্ত জীবনটা নিয়ে এ ঘর থেকে আজ আর বের হতে পারবে না, মরার আগে কৌতূহলটা মেটাবে কি? 'ক্-ক্যামনে জানলা, ভাই?' সামান্য তোতলাল সে।

পরিহাসের হাসি ফুটে উঠল ফেরদৌসের ঠোঁটে, আলতো করে মাথা দোলাল সে। সতর্কতাকে স্বভাবে পরিণত করেছে। তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ লোকটিও জানে না, বালিশের নিচে সব সময় পিস্তলটা এমনভাবে রাখে যেন ডানহাত দিয়ে একথাবায় সেটার বাঁট ধরে গুলি করতে পারে। ও রকম দরকারি মুহূর্তে এক সেকেন্ডও অনেক মূল্যবান। তার এই ছোট্ট সতর্কতার বাড়তি একটা সুবিধাও আছে, অন্য কেউ তার অনুপস্থিতিতে পিস্তলে হাত দিলে সে বুঝে ফেলে। যেমন আজ বুঝতে পেরেছে যে পিস্তলটার বাঁট একেবারে বিপরীত দিকে ছিল! লম্বা করে শ্বাস নিল সে। কঠিন একটা

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, পিস্তল রাখার
এই ব্যাপারটা বাঁচিয়ে রাখবে!

‘ওইটা তোমার জানার দরকার নাই।’
স্থিরচোখে তাকিয়ে রইল আনিস।

তবে কি সে এ যাত্রায় বেঁচে গেল?

(প্রথম আলো দৈনিক প্রত্রিকা থেকে সংকলিত)
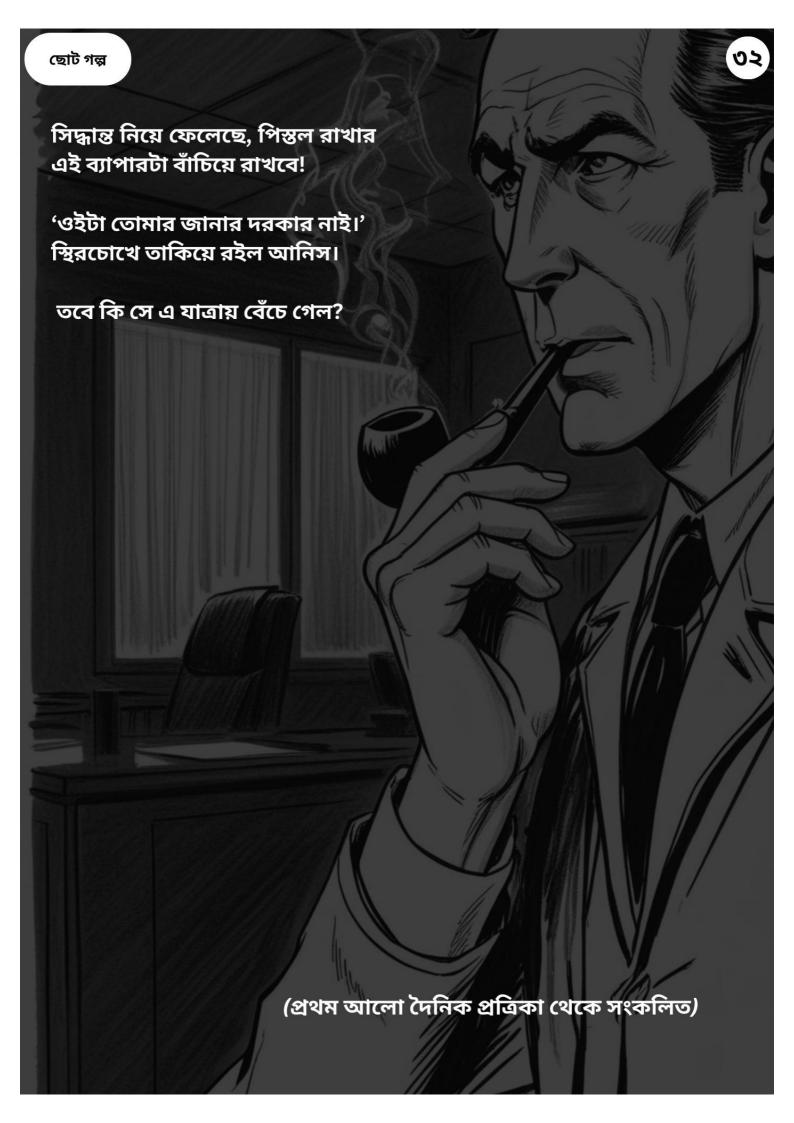
সঙ্কটের আহ্বান

সোমবারে সঙ্কট এর তৃতীয় সংখ্যা আশা করছি সবার ভালো লেগেছে। তৃতীয় সংখ্যাটি আপনার কেমন লেগেছে তা জানাতে ভুলবেন না আমাদের। আপনার রিভিউ, সমালোচনা বা কোন মতামত জানাতে পারেন সোমবারে সঙ্কটের Facebook এ।

সোমবারে সঙ্কটের চতুর্থ সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। লেখার বিষয়বস্তু,পাঠানোর নিয়ম ও পাঠানোর শেষ সময় সব পাবেন সোমবারে সঙ্কট Facebook page এর পিন পোস্টে। তাহলে দেরি না করে সঙ্কটের আহ্বানের সাড়া দিয়ে শ্রীঘ্রই পাঠিয়ে দিন আপনার লেখা। এছাড়া আর কোন তথ্য জানার দরকার হলে যোগাযোগ করতে পারেন সোমবারে সঙ্কটের মেসেঞ্জারে বা ই-মেইলে।

ই-মেইল : mondaycrisis0824@gmail.com
ফেসবুক : https://www.facebook.com/mondaycrisis

Scan করুন